Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
ISSN 2583-6706 (Online)
Volume-2 Issue-2 January 2024

ওলাবিবি : হাওড়া জেলার প্রেক্ষিতে

সুচিত্রা কড়ার

Link : https://bit.ly/3tWJ3yG

সারসংক্ষেপ : গ্রাম বাংলার লৌকিক দেবী ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী। সাধারণ খেটে খাওয়া গ্রামবাসী কলেরা রোগের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে ওলাবিবির থানে পুজো বা হাজোত দেয়। মানুষের বিশ্বাস তাঁদের পাশে ওলাবিবি দাঁড়ান। ওলাবিবির পুজো চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাৎসরিক ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় করেন। তাঁদের কাছে দেবীর মূর্তি বা বিগ্রহ হিসাবে মাটির ঢেলা বা পাথরের টুকরোই মান্যতা পেয়েছে। ওলাবিবির পুজো বাংলার লোকসংস্কৃতিতে হিন্দুর দিব্য জননী ধারণার সঙ্গে ইসলামিক আল্লাহ্ ধারণার মিশ্রণ। তাই আমরা বলতে পারি, ওলাইচণ্ডীর গুরুত্ব সাম্প্রদায়িক ও বর্ণব্যবস্থার সীমারেখাকে ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ওলাবিবি লৌকিক দেবী হিসাবে হাওড়া জেলার মানুষের কাছে কীভাবে গ্রহণীয় হয়েছে, সেটিই আমরা দেখানোর চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : গ্রাম বাংলার মানুষ, লৌকিক দেবদেবী, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়, কলেরা, সাতবোন, বৃক্ষতলা, মাঙন, ছলন, সিন্নি, মাটির ঢিপি, নৈবেদ্য, ঢিল-বাঁধা, হাওড়া জেলা, ওলাবিবিতলা লেন

১

গ্রাম বাংলার জনজীবনে লৌকিক দেব-দেবীর অন্ত নেই। গ্রামের পথে-ঘাটে, বিশাল প্রান্তরে, বৃক্ষতলে এঁদের পুজোর আসন দেখা যায়। প্রকৃতির প্রতিকূলতা, বিপদ-সংকট থেকে রেহাই, ধনসম্পত্তি লাভ, সন্তান লাভ, শস্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি, বৃষ্টি, খরা নিবারণ, পুত্রকন্যার বিবাহ, রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য লাভ, এমনকি হাঁস মুরগীর ডিম পাড়া — এইসব কামনায় লৌকিক দেবদেবীর পুজোর প্রচলন আছে গ্রামীণ সমাজে। মানুষের শরীরের বিভিন্ন রোগের জন্য যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিকিৎসা করেন তেমনি লৌকিক মতেও ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর পুজো করে আরোগ্য লাভের আশায় গ্রামীণ মানুষ। যেমন, অজানা জ্বর, ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি জ্বরের প্রকোপ বাড়লে গ্রামীণ মানুষ জ্বরাসুরের পুজো দেয়। আবার বসন্ত হলে শীতলা, খোস-পাঁচড়া হলে পাঁচু ঠাকুর এবং কলেরার জন্য ওলাবিবির থানে মানুষ যায়। এই দেবদেবীর সম্মুখে তারা মাথা ঠোকে এবং নিজেকে সঁপে দেয়। আমাদের আলোচনার এরকম এক লৌকিক দেবী ওলাবিবি। নামেই বোঝা যায় ওলাবিবি মুসলমান দেবী। কিন্তু তাঁর আরেক হিন্দু নাম ওলাইচণ্ডী। আমরা যদি জনপ্রিয়তার দিক থেকে দেখি, তাহলে পঞ্চানন ঠাকুরের পরেই এঁর স্থান। অসুস্থতায় ওলাবিবির পরিচয় এতটাই বৃহৎ যে হিন্দু ওলাইচণ্ডী ও মুসলমান ওলাবিবিতে তফাৎ নেই। ওলাওঠা মহামারী বা কলেরা রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে ওলাবিবি সর্বত্র পূজিতা। তাই কলেরা বা ওলাওঠার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই দেবীকে ওলাবিবি নামে ডাকা হয়।

২

নামকরণ

লোকবিশ্বাস অনুসারে ওলাবিবি ওলাওঠা (কলেরা) রোগের দেবী। বিসূচিকা বা কলেরার অপর নাম ‘ওলাউঠা’ বা ‘ওলাওঠা’। তবে এই শব্দ দু’টি প্রচলিত গ্রাম্য শব্দ — ‘ওলা’ ও ‘উঠা’ বা ‘ওঠা’র সমষ্টি। ‘ওলা’ অর্থে ভেদ বা তরল মলনিঃসরণ অর্থাৎ অবতরণ বা অবরোহণ। এবং ‘উঠা’ বা ‘ওঠা’ শব্দের অর্থ উঠে যাওয়া বা বমি হওয়া। ওলা + উঠা>ওলাউঠা অর্থাৎ ভেদবমি বা বিসূচিকা। এই ওলা ও উঠা দুটি চলিত কথার সমষ্টিকে ওলাওঠা / ওলাউঠা রোগ বলে। বাংলায় এই রোগকে বিসূচিকা, ইংরেজিতে কলেরা বললেও হিন্দিতে ‘উলার’ এবং গুজরাটিতে ‘উলাহ’ বলা হয়। জেলাভেদে এই রোগ বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মালদহে ‘নামাতোলা’ এবং দুই চব্বিশ পরগনা জেলায় এর নাম ‘বাজারভাব’। লোককথার কিংবদন্তি অনুযায়ী ওলাইচণ্ডী মায়াসুরের পত্নী। মায়াসুর হিন্দু পুরাণের অসুর, দানব, রাক্ষস ও দৈত্যদের রাজা ও স্থপতি। ভক্তেরা তাঁর পত্নীকে কলেরার ত্রাণকর্ত্রী দেবী মনে করতেন। রোগ ও মহামারীতে আক্রান্ত অঞ্চলে তাঁর পুজো হয়। ওলাইচণ্ডী দেবীর আদি নাম ওলাউঠা-চণ্ডী বা ওলাউঠা-বিবি। সংক্ষেপে ওলাবিবি বলা হলেও এর পূর্ণ নাম ওলাউঠাবিবি। এই প্রেক্ষিতে মুসলিম সমাজে ওলাবিবি বা বিবিমা

নামের কিংবদন্তি প্রচলিত রয়েছে। দেবী এক কুমারী মুসলমান রাজকন্যা। একদা তিনি অলৌকিক উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যান এবং পরে দেবীরূপে আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবের কারণ হিসাবে জানা যায়, তাঁর দাদামশাইয়ের (বাদশা) রাজ্যের মন্ত্রীদের, তাঁদের সন্তানদের রোগ থেকে আরোগ্য দান করা। তাই তাঁকে বিবিমা বলেও ডাকা হতো।

৩

ওলাবিবির সাতবাহুনী রূপ

হিন্দুদের কাছে ওলাইচণ্ডী দেবী চণ্ডীরই রূপ। অঞ্চলভেদে দেবী চণ্ডীর ভিন্ন ভিন্ন রূপে পুজো দেখতে পাওয়া যায়। চণ্ডীর এই লৌকিক রূপের মধ্যে পড়ে জয়চণ্ডী, মাকালচণ্ডী, বড়ামচণ্ডী, বিজয়চণ্ডী, ফিরাইচণ্ডী, ললাটচণ্ডী, ভেতীচণ্ডী, বল্লুকচণ্ডী, ভাণ্ডারচণ্ডী, মগবাচণ্ডী, গজাইচণ্ডী, যুগলচণ্ডী, শুভচণ্ডী, কল্যাণচণ্ডী, বারাহীচণ্ডী, হাটচণ্ডী, মেলাইচণ্ডী, বেতাইচণ্ডী প্রভৃতি। তবে দেবী চণ্ডীর এই রূপগুলি সবই গ্রামদেবী বা বনদেবীরূপে কল্পিত। তিনি পূর্বে বনদেবী রূপেই পূজিতা হতেন। আধুনিক সমাজের বিবর্তনের মাধ্যমে চণ্ডী কালক্রমে কোথাও কোথাও শাস্ত্রীয় দেবীর পুজো পেতে শুরু করেছেন। তবে তা অভিজাত শ্রেণির কাছে নয়। ওলাইচণ্ডীর পুজো অব্রাহ্মণরাও করেন। ওলাইচণ্ডী ও ওলাবিবি একই দেবী হওয়ায় তাঁদের একক পুজো ছাড়াও কোনো কোনো স্থানে সাতবোন বা নয় বোনকে নিয়ে একসঙ্গে পুজো পেতে দেখা যায়। ওলাবিবির সাত বোন ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, আজগৈবিবি, চাঁদবিবি, বাহড়বিবি, ঝেটুনেবিবি ও আসানবিবি। এঁদের একত্রে সাত বোনকে 'সাতবিবি'ও বলা হয়। তবে হিন্দু-মুসলিম সমাজে আলাদা নামে পুজো হলেও এঁদের সাতবোন কিন্তু এক। কেউ কেউ মনে করেন 'সাতবিবি'র ধারণাটি হিন্দু সপ্ত-মাতৃকা থেকে এসেছে। এই সপ্ত-মাতৃকা হলো ব্রহ্মাণী বা ব্রাহ্মী, মহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী বা ঐন্দ্রী, কৌমারী,চামুণ্ডা প্রভৃতি পৌরাণিক দেবীর লৌকিক রূপ। তবে চামুণ্ডাকে কোথাও কোথাও নরসিংহী বলা হয়ে থাকে। এঁদের একত্রে পুজোর প্রথা প্রাচীন ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিলো। কোথাও কোথাও এই সাত দেবীর মূর্তিরও সন্ধান মেলে। যেমন, অধুনা পাকিস্তান রাষ্ট্রের সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত প্রাচীন মহেঞ্জোদারো শহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত একটি মৃণ্ময় ফলকে সাতটি নারীমূর্তিকে পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখা যায়। আবার কারো কারোর মতে, সপ্ত-মাতৃকাগণ আসলে অষ্ট-মাতৃকা — তাঁরা সংখ্যায় আটজন। এই মাতৃকারা নেপালে অষ্টমাতৃকা এবং দক্ষিণ ভারতে সপ্তমাতৃকা নামে পূজিতা হন। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন — 'দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি পল্লীতে সাতটি বনদেবী ভগ্নীর একত্র পূজা হয়, 'সপ্ত-কালিংগেস' এবং 'মীনাক্ষী ও তাঁর ছয় ভগ্নী',... সাত দেবী ভগ্নীর অনুরূপ।' কোনো রোগের প্রাদুর্ভাব কালে দক্ষিণ ভারতের কুঙালোর অঞ্চলে এই সাত দেবীর বিশেষভাবে পুজো দেওয়া হয়। গ্রামের মানুষ গ্রাম্য ছড়ায় এই সাত বোনকে ডাকেন —

নদীর ধারে সুরগুজা ফুল ফুটে লালে লাল
হিলতে আয়রে দুলতে আয়রে

সাতবহিন সাত ফুলে আয়।[১]

তবে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এই সাত বিবির কাহিনিতে দেখান — ব্যাধির বীজভরা কুঁজ নিয়ে সাত বিবি আকাশ থেকে গভীর রাতে সোজা বাদশার শয়নকক্ষে উপস্থিত হন। বিবিরা বাদশাকে বলেন —

শুন বাদশা গুণমণি, ঘুমে দেছ মন।
শিয়রে মা সাতবিবি ডাকে, হওরে চেতন।।
হাজোত যদি না দিবে, ভালে ভাল।

কাল তোমার সহরে দিব মড়া জাঙ্গাল।।[২]

সকালবেলা দরবারে বাদশা সকলকে আগের রাতের কথা জানান। তিনি ভয় পেয়েছেন বিবিদের দেখে, তাঁদের হাজোত দেবার মনস্থ করেন। কিন্তু উজীর নাজীর বাধা দেন। অশরীরী অবস্থায় সাত বিবি সেখান থেকেই ক্রুদ্ধ হয়ে মারণমন্ত্র ছাড়েন—

দাওন কারকুন যে যেখানে ছিল।
দেখতে দেখতে সকলের প্রাণ উড়ে গেল।।[৩]

তখনই উজীরের সাত পুত্র রক্তবমি করে মারা যায়। বাদশা আর স্থির থাকতে না পেরে, ভয়ে ভক্তিতে সাত বিবির কৃপা প্রার্থনা করেন। তখন সাতবিবি প্রকাশ করেন —

বাইশের বন্দ ঘর, তার চার হাত কোঠা।
দেখিতে সুন্দর হবে, বিজলীর ছটা।।
মউরের পুচ্ছ দিয়ে চাল ছাওইবে।
তবে ত আমার হাতে নিস্তার পাইবে।।[৪]

বাদশা উজীর সকলে সাত বিবিদের আরাধ্য বলে স্বীকার করেন। বিবিরা —

আল্লা রসুল বলে যখন দস্ত ফিরায় গায়
উজিরের সাতপুত্র যাহান বকসিস্ পায়।।[৫]

হিন্দুর সাত বোনের নারীমূর্তিগুলি পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে এই সাত বিবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

৪

পুজোর স্থান

লৌকিক দেবদেবীর পুজো গাছতলায় বা কুঁড়ে ঘরে শিলাখণ্ড, মাটির ঢিপি, পোড়ামাটির হাতিঘোড়া বা জীবন্ত গাছের প্রতীকে হয়। অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মতো ওলাবিবির পুজো গৃহে বা বাস্তু ভূমিতে হয় না। ওলাদেবীর পুজো গ্রামের বৃক্ষতলার পর্ণকুটিরে হয়। এই বৃক্ষতলের পর্ণকুটিরে ছয় ভগ্নি একসঙ্গে থাকেন। তাই ওলাবিবির থানকে সাতবিবির থানও বলা হয়। তবে সাত ভগ্নির মধ্যে ওলাবিবি সর্বাপেক্ষা সমাদৃত। তাঁর উদ্দেশ্যে ভক্তরা পুজো বা হাজোত উৎসর্গ করলে অপর ভগ্নিরাও ভাগ পায়। প্রথম দিকে গাছতলা, বনাঞ্চল ও জলাশয়ের ধারে অবস্থিত থানে তাঁর পুজো প্রচলিত হলেও পরবর্তীকালে ওলাইচণ্ডীর মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। যেমন কলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে, টালিগঞ্জের বাবুরাম ঘোষ স্ট্রিট, হাওড়ার কাসুন্দিয়া অঞ্চলে, বীরভূমের বোলপুরে নীলকুঠির পাশে, মেদিনীপুরের গড়বেতার রাজকোটের দুর্গে, চব্বিশ পরগনার জয়নগর প্রভৃতি জায়গায়। হাওড়া জেলায় ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে, এগুলির কোনো কোনোটি অন্য দেবতার মন্দির, তবে ওলাইচণ্ডীরও পুজো হয়। আবার কোনো ওলাইচণ্ডীর মন্দিরে অন্য দেবতারও পুজো হয়।

৫

পুজোর কাল

ওলাবিবির পুজো চৈত্র-বৈশাখ মাসে বাৎসরিক ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় করেন। কোথাও কোথাও মাঘ মাসের প্রতি শুক্রবার রাতে বিবির জন্য জাগরণের পালা গাওয়া হয়। মুসলমান মেয়েরা সারারাত ধরে জাগরণের গান গায়। কলেরার হাত থেকে রক্ষার আর্তি থাকে এই জাগরণের গানে। শ্রোতা হিন্দু-মুসলিম সবাই। এখানেও সম্প্রীতির মেলবন্ধন আমরা দেখতে পাই। তবে সর্বত্র এই নিয়মগুলি মান্যতা পায় না। হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে শনি এবং মঙ্গালবারেই ওলাইচণ্ডীর বিশেষ পুজো হয়ে থাকে। কারণ শনি এবং মঙ্গালের প্রকোপ থেকে বাঁচতে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে এই দেবীর পুজো করা হয়। আবার মুসলিম প্রধান অঞ্চলে ওলাবিবির পুজো শুক্রবারে হয়।

৬

পুজোর উপচার-উপকরণ-পদ্ধতি

হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছে ওলাবিবি একই কিন্তু নামের ভিন্নতা থাকলেও কর্মকাণ্ড এঁদের একই। ওলাবিবি লৌকিক দেবী হওয়ায় পুজোর বিশেষ কোনো মন্ত্র নেই। তবে কোনো কোনো হিন্দু পুরোহিত পুজোর সময় 'এসো মা ওলাবিবি, বেহুলা রাঁঢ়ির ঝি' মন্ত্র উচ্চারণ করেন। কিন্তু এর অর্থ কী বোঝা যায় না। তবে হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডী পুজোয় দেবী চণ্ডীর পুজোর মন্ত্র বা আচার পালন করা হয় না। এই পুজোয় পুরোহিতের প্রয়োজন থাকত না তাই ব্রাহ্মণ্য রীতি দেখা যেত না। কিন্তু বর্তমানে ওলাবিবির অনেক জায়গায় হিন্দু পুরোহিত ও মুসলমান ফকির দুজন একসঙ্গে দু'পাশে আরাধনা বসে করেন। এই পুজোয় কিছু অঞ্চলে নারীরাও পৌরোহিত্য করেন। আবার হাঁড়ি বা ডোমপ্রধান নিম্নবর্গ অঞ্চলে তাঁরা নিজেরাই পৌরোহিত্য করেন এবং তাঁদেরই এবং তাঁদেরই অগ্রাধিকার। ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির পুজো তিন ধরনের —

ক। শনিবার এবং মঙ্গালবার অনাড়ম্বরে যে পুজো হয় তা বারের পুজো বা নিত্য পুজো। নিত্য পুজোয় কোনো জাঁকজমক থাকে না। তাই ভক্ত ও পুরোহিতদের সাধ্যমতো ব্যয় হয়। ছাগবলির দিন আড়ম্বরের মাত্রা কিছুটা বাড়ে।

খ। মানত উপলক্ষে সামান্য আড়ম্বরের সঙ্গে যে-কোনো সময় এঁর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। বছরে একবারের জন্য হলেও সমবেতভাবে বিশেষ পুজো করে গ্রামবাসীরা। সারা বছর থান একাকী থাকলেও এই সময় থান ভক্তদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে।

গ। কোথাও কলেরা রোগ মহামারীর আকারে দেখা দিলে; সে এলাকার লোকজন গ্রামের মোড়লের নেতৃত্বে সমষ্টিগতভাবে এঁর পুজো দেয়।

পুজোর সময় ওলাবিবির থানে চাঁদোয়া টাঙানো হয়। ধূপ, ধুনা, প্রদীপ জ্বেলে, চাঁদমালা পরিয়ে মন্ত্রপাঠ করা হয়। হিন্দুরা ফল, সিঁদুরের প্যাকেট দেয় পুজোয়। এই সিঁদুর ঢালা হয় ওলাবিবির থানে। বাৎসরিক পুজোয় ধুনা পোড়ানোর রীতি প্রচলিত রয়েছে কিছু কিছু জায়গায়। বর্তমানে কলেরা প্রসঙ্গ না থাকলেও প্রথাগত ও পারম্পরিক ভাবে গ্রামে শনিবার ও মঙ্গালবার এবং মুসলিম প্রধান অঞ্চলে শুক্রবার একত্রিত হয়ে ওলাবিবির পুজোর আয়োজন করা হয়। ওলাবিবির থানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাতি, ধূপ দিয়ে সন্ধ্যা আরাধনা করা হয়।

ওলাইচণ্ডীর ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম সোমবার পালিত হয়। অশ্বত্থ ও বটগাছ যেখানে একসঙ্গে আছে সেই গাছের তলায় এই পুজো করা হয়। মূলত ওলাওঠা এবং অন্যান্য রোগজ্বালা থেকে বাঁচতে, অপদেবতার থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় সমবেত গ্রামবাসীরা এই ব্রত পালন করেন। গ্রাম প্রধানের তত্ত্বাবধানে মানতের পুজো বা হাজোত দেওয়ার সময় বিশেষ লোকায়ত বিধিপালন করতে হয়। এর মধ্যে প্রধান 'মাঙন' ও 'ছলন' দেওয়ার প্রথা আছে। এই প্রথায় গ্রামের মোড়ল বা প্রধান ব্যক্তি খড়ের হার গলায় পরে দাঁতে একটি তৃণ নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুজোর জন্য অর্থ, চাল, ফল-মূল ইত্যাদি চেয়ে সংগ্রহ করেন। একেই 'মাঙন' প্রথা বলা হয়। মাঙনে প্রাপ্ত ফল-ফুল দিয়ে ওলাইচণ্ডীর পুজো করা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে মাঙনে যুবকদেরও অংশ নিতে দেখা যায়। ওলাবিবির পুজোর এই 'মাঙন' রীতি প্রাচীন Food gatheringএর দৃষ্টান্ত। পুজোর পূর্ব রাত্রে ওলাইচণ্ডীকে নিয়ে গ্রামের প্রতিনিধি রূপে একজন গায়েনকে সারা রাত দেবীর মাহাত্ম্য গান করতে হয়। আবার কোথাও মানুষ ওলাবিবির ক্ষুদ্রাকৃতি মূর্তি তৈরি করে দেবীর থানে রেখে দেয়। এই মূর্তিকে 'ছলন' বা 'সলন' দেওয়া বলা হয়। ভক্তরা কলেরা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া বা অন্য ইচ্ছা পূরণের আশায় দেবীর থানের জানালায় বা থানের সংলগ্ন কোনো গাছের ডালে দড়ির সাহায্যে একটা ঢিল বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে। একে 'ঢিল-বাঁধা' মানত বলে। ইচ্ছা পূর্ণ হলে বা রোগ মুক্তির পর ওই ঢিল খুলে ওলাবিবিকে বিশেষভাবে পুজো দেওয়া হয়।

দেবী ওলাইচণ্ডীর নৈবেদ্য জায়গা বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হয়। তবে সন্দেশ, পান সুপারি, বাতাসা, আতপচাল, পাটালি ইত্যাদি শুকনো নৈবেদ্যে পুজো হলেও বাৎসরিক পুজো বা বিশেষ পুজোয় অন্নভোগ দেওয়ার রীতি বহু প্রাচীন। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে ভালো চাষের ফসল বা গরুর বাচ্চা হলে সেই গরুর প্রথম দুগ্ধও ঘটি করে দেবীর পুজোয় দেওয়া হয়। ওলাবিবির পুজোর 'সিন্নি' তৈরি করে স্থানীয় মুসলিম পরিবার। এর জন্য তারা নতুন মাটির সরাতে সুগন্ধি সরু চাল, চিনি, বাতাসা, কিসমিস, কাজু ফুটিয়ে পায়েস বা ক্ষীর তৈরি করে। একেই বলে 'সিন্নি'। পায়েস তৈরির জন্য নতুন করে উনুন খোঁড়ে সেই মুসলিম পরিবারের সদস্য। জ্বালানি হিসেবে এক ধরনের শুকনো পাতা বা শুকনো তালপাতা সংগ্রহ করা হয়। অন্য কোনো জ্বালানি উনুনে দেওয়া হয়না। এই সিন্নি পৌঁছে দেওয়া হয় ওলাবিবির থানে। পুজোর পর সকলকে এই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পায়েস জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাই ভাগ করে গ্রহণ করে। তবে নিম্নবর্গে হাঁড়ি বা ডোমদের ওলাবিবির পুজোয় নানাবিধ বলি দেওয়ার প্রথা আছে। যেমন নদীয়া জেলার ডোম জাতি মানুষেরা দেবীর পুজোয় ছাগবলি দেন।

৭

ওলাবিবির মূর্তি

ওলাবিবির কোনো মূর্তি নেই। কোথাও তিনটি বা কোথাও সাতটি করে উঁচু অর্ধগোলক মাটির ঢিপি আছে। পূর্বে মাটির থাকলেও বর্তমানে সিমেন্ট দিয়ে এই ঢিপি তৈরি করে লাল রঙ করা হয়। আধুনিক কালে মানুষ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির মূর্তির নবরূপায়ণের চেষ্টা করেছে। হিন্দু প্রধান অঞ্চলে দেবীর রূপ অনেকটা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আদলে গঠিত। তাঁর গায়ের রং হলুদ অথবা সবুজ, মুখ সুন্দর, দ্বিনয়না বা ক্ষেত্রবিশেষে ত্রিনয়না, সম্প্রসারিত দুটি হাত, এলোকেশী অথবা কোথাও মুকুট-পরিহিতা, অলংকারে সুসজ্জিতা, পরনে শাড়িও দণ্ডায়মান হয়। তবে মস্তকের আবরণ ও অলংকারে মুসলমানী প্রভাব কিছুটা দেখা যায়। কোথাও কোথাও দেবীর মূর্তিতে দেবী ষষ্ঠীর মতো ওলাবিবির কোলেও শিশু রয়েছে। কিছু অঞ্চলে মানুষ বাহন হিসেবে দেবীর পাশে ঘোড়া দেয়। আবার মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে দেবীর মূর্তি অভিজাত ঘরের কোনো কিশোরীর মতো সুন্দরী। তাঁর পরিধানে থাকে পিরান-পাজামা, ওড়না, মাথায় টুপি, পায়ে নাগরা জুতো ও সঙ্গে কখনো কখনো মোজা থাকে এবং গায়ে নানা অলঙ্কার। এঁর এক হাতে আসাদণ্ড যা দিয়ে ভক্তের মুশকিল আসান করেন। ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবির পুজোয় তাঁর মূর্তির পাশে আরো ছয় মূর্তি দেখা যায়। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই এই সাত ভগ্নির নাম একই। অন্যান্য লৌকিক দেবীর মতো ওলাইচণ্ডী মহামারীর দেবী হলেও তাঁকে দেখতে কুৎসিত নয়। আমাদের অলৌকিক দেবী লক্ষ্মী-সরস্বতীর মতোই সুশ্রী ও সুন্দর। বহু প্রচলিত ধারণা

ওলাইচণ্ডী মা মঙ্গালচণ্ডী অর্থাৎ দেবী পার্বতীর ছিন্ন কেশ থেকে সৃজিত দেবী।

৮

লৌকিক বিশ্বাস

সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কলেরা রোগের কাছে অসহায়ত্ব প্রকাশ করে ওলাবিবির থানে পুজো বা হাজোত দিয়ে থাকে। মানুষের বিশ্বাস তাঁদের পাশে ওলাবিবি দাঁড়ান। শুধু কলেরা নয় সন্তান লাভের আশায় বন্ধ্যা নারী ওলাবিবির থানে ঢেলা বেঁধে মানত করে। এসব লৌকিক রীতি। কলেরার মতো অতি সংক্রমণ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় মানুষ ওলাবিবির পুজো দিলেও এর প্রাদুর্ভাব কম হয় কিনা তা যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই। তবে এই কথা বলা যায়, এই লোকাচার মানুষের বিশ্বাসের অনেক গভীরে পৌঁছে গেছে। তাকে সহজে হয়তো উপড়ানো যাবে না। ওলাবিবির চুল খোলা, হাতে আসাদণ্ড বা কোথাও ঝাঁটা থাকে। অর্থাৎ তিনি রোগজীবাণু সমস্ত নিজের হাতে পরিষ্কার করে দেন, এই মানুষের বিশ্বাস। কলেরা মহামারী প্রবল আকারে দেখা দিলে ভক্তদের জলপড়া, তেলপড়া-সহ শিশুদের শরীর ঝাড়ানোর ব্যবস্থা করে মৌলভী বা পুরোহিত উভয়েই। বাংলার গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস, ওলাবিবি বা বিবিমা যে গ্রামে অধিষ্ঠান করেন, সেই গ্রামকে সমস্ত দিক থেকে তিনি রক্ষা করেন। শত প্রতিকূলতার মাঝে অন্যান্য লৌকিক দেবীর মান্যতা কমে গেলেও ওলাবিবি বহুদিন — বহুশতাব্দী স্বমহিমায় রয়েছেন।

৯

হাওড়া জেলার ওলাবিবি

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে হাওড়া জেলা। দেবী চণ্ডী অনার্য দেবী। হাওড়া জেলায় পূর্বে বনাঞ্চল বেশি থাকায় দেবী চণ্ডী বনদেবী রূপে পূজিতা হতেন। মানুষ বনের দেবী হিসাবে পশু হত্যা বা শিকারে যাওয়ার আগে দেবীর আরাধনা করত। ওরাওঁ জাতির দেবী 'চাণ্ডী' হিন্দুদের দেবী চণ্ডীতে পরর্বতী সময়ে রূপান্তরিত হয়েছেন। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, 'চণ্ডী দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দেবী' বেদের রুদ্র — বৌদ্ধ প্রভাবে শান্ত মাতৃমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। এই জেলায় দেবী চণ্ডীর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় দেবী চণ্ডীর যে রূপের পুজো করেন তা হলো ওলাইচণ্ডী বা ওলাবিবি। এঁর পুজো পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ অংশে বেশি প্রচলন হলেও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই এই পুজো দেখা যায়। Vibrio cholera একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। হাওড়া জেলায় একসময় কলেরা এবং বসন্ত রোগের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় প্রচুর মানুষের মৃত্যু হয়। কলেরা রোগ নির্মূলীকরণের দেবী হিসাবে হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ওলাবিবির পুজোর প্রচলন হয়। এই জেলার অধিকাংশ স্থানে এই দেবীর থান আছে। যেমন, ওলাবিবিতলা লেন, ডোমজুড়, বীর শিবপুর, বাগনান, আমতা, পাঁচলা, শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া-সহ একাধিক জায়গায়। হাওড়ার কোথাও স্বতন্ত্র থানে বা কোথাও মন্দিরে বসন্ত রোগের দেবী শীতলার সঙ্গে ওলাবিবির আরাধনা করা হয়।

মধ্য হাওড়ায় কাসুন্দিয়া অঞ্চলে ওলাবিবিতলা লেনে অবস্থিত ওলাবিবি বিখ্যাত। এই রাস্তার নামও দেবীর নামকে কেন্দ্র করে রাখা হয়েছে। এখানে দেবী ওলাবিবির স্থায়ী স্থান আছে। স্থানীয় মানুষ সাতটি ছোট আকারের ঢিপি বা স্থানকে দেবীর মূর্তি হিসাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করে থাকে। দেবীর বেদী একজন মুসলমান ফকির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাই এখানকার পুজারী মুসলমান ফকির। এখানেও কক্ষের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতি কয়েকটি ঘোড়া, ছলন বা ছোটো মূর্তি এবং জানালার নিকট মানতের ঢিল দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ঝোলা দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে বাৎসরিক শীতলা পুজোর দিন দেবীর পুজো হয়। হাওড়া জেলার বীর শিবপুর-সহ কয়েকটি স্থানে ওলাবিবির পুজোয় নামাজ পড়ানো হয়। এবং তাঁকে একটি সিধে দেওয়ার রীতি আছে। ডোমজুড়ের উত্তর মৌড়ি খটির বাজারের নিকটে সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে কাঠের পুলের কাছে দেবীর দক্ষিণ ও পূর্বমুখী চারচালা মন্দির আমরা দেখি। এই মন্দিরের ভিতর একটি বেদীর উপর স্তুপ ও অসংখ্য পোড়ামাটির ঘোড়া আছে। পয়লা মাঘ এখানে পুজো উপলক্ষে মেলা হয়। আন্দুলে কুলুঙ্গির মতো মন্দিরে ওলাবিবি বা ওলাইচণ্ডীর পাঁচটি স্তুপ রয়েছে।এখানে বাৎসরিক পুজো হয় চৈত্র মাসে। এই সময় দেবীর গান হয়। আবার আমতা রসপুরে তিনটি স্তুপ ও ভক্তদের দেওয়া পোড়ামাটির কিছু ঘোড়া আছে। আমতার গাজীপুরে ছোটো চাতালে কিছু পোড়ামাটির ঘোড়া ওলাবিবির মানত হিসাবে মানুষ পুজো দিয়েছে। এখানে বৈশাখ মাসে দেবীর ঘট পুজো হয়। বাগনানের বাঙালপুরে চিত্রকর পাড়ার পিছনের পুকুর পাড়ের চাতালে ওলাইচণ্ডীর ঘট রয়েছে। এখানে বাৎসরিক পুজো হয় ২০অগ্রহায়ণ। উলুবেড়িয়ার বাড়বেড়িয়ার মাঝের পাড়ায় দেবীর ছোট্টো স্তুপ আছে। এখানে বাৎসরিক পুজো ফাল্গুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন দেবীর গান হয়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, ওলাবিবির মানতের বা পুজো দেওয়ার একটি প্রধান উপকরণ ঘোড়া। তবে হিন্দুপ্রধান সব পাড়াতেই ওলাবিবি ওলাইচণ্ডী নামেই খ্যাত। উলুবেড়িয়ার বীরশিবপুর গ্রামে ছ'টি শীতলা পুজো হয়। শাঁখরাইল হীরাপুরে দেবীর ছোট স্তুপ আছে, এখানে বৈশাখ মাসে বাৎসরিক পুজো হয়। হাওড়া জেলায়

কমবেশি প্রত্যেকটি গ্রামেই শীতলার স্থান বা মন্দির সংলগ্ন স্থানে একটি করে স্তূপ করা আছে এবং এখানে ওলাবিবির পুজো করা হয় শীতলা পুজোর সময়।

১০

সামাজিক প্রভাব

ওলাইচণ্ডী বাংলার লোকসংস্কৃতির লৌকিক দেব-দেবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। বিশেষজ্ঞের মতে, এখানে হিন্দুর দিব্য জননী ধারণার সঙ্গে ইসলামিক আল্লাহ্‌র ধারণার মিশে গেছে। তাই ওলাইচণ্ডীর গুরুত্ব সাম্প্রদায়িক ও বর্ণব্যবস্থার সীমারেখাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তবে উভয় পাড়া ভেদে দেবীর মূর্তি ও পুজো পদ্ধতিতে কিছুটা পার্থক্য আছে। পুজোর পুরোহিত হিন্দু কিংবা মুসলমান হলেও কেউ তাঁর কাছ থেকে নৈবেদ্য গ্রহণে দ্বিধা করে না। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চল-সহ বিভিন্ন গ্রামে একসময় খুব গুরুত্বের সঙ্গে ওলাবিবির পুজো অনুষ্ঠিত হতো। দেবীকে আরাধনার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে সবাই পরিবারের সকল মানুষের উপর থেকে কলেরা রোগের ভয় দূর করে। বর্তমানে আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভাবে সমাজ থেকে এসব আচার এক প্রকার উঠে গেছে বলা যায়। এবং পূজার্চনার বহরও অনেক কমে গেছে। তবু এখনো এই লৌকিক দেব-দেবীর পূজাগুলি মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের দ্বারা টিকে আছে আমাদের সমাজে। এইসব পুজোয় প্রতিটি গ্রাম উৎসব মুখর হয়ে উঠে — মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তথ্য সূত্র :

১। https://www.jaladarchi.com/2023/02/olabibir-puja-bhaskarbrata-pati.html
২। ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৬, পরিবর্ধিত দে’জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ৯৯
৩। ওই, পৃ. ৯৯
৪। ওই
৫। ওই, পৃ. ১০০

গ্রন্থ ঋণ :

১। অচল ভট্টাচার্য্য, ‘হাওড়া জেলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)’, ১০/১, জি. টি. রোড, হাওড়া ৭১১১০১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুআরি ১৯৮০
২। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ‘বাংলার লৌকিক দেবতা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৬, পরিবর্ধিত দে’জ সংস্করণ এপ্রিল ১৯৭৮
৩। তপনকুমার সেন, ‘হাওড়া জেলার লোকসংস্কৃতির সন্ধানে’, সাহিত্যশ্রী, ৭৩মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০২১
৪। তারাপদ সাঁতরা, ‘হাওড়া’, সুবর্ণরেখা, ৭৩মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম মুদ্রণ ২০০০
৫। দেবব্রত নস্কর, ‘বাংলার লোকদেবতা ও সমাজসংস্কৃতি’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশ ২০১৮
৬। হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘হাওড়া জেলার ইতিহাস’, ভাস্বতী, ১০৩সি, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১ জানুআরি ১৯৯৯
৭। https://www.jaladarchi.com/2023/02/olabibir-puja-bhaskarbrata-pati.html

লেখক পরিচিতি :

সুচিত্রা কড়ার : বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের বৃত্তিভোগী গবেষক। সাহিত্য ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।